‘সুজন’ প্রস্তাবিত নির্বাচনী ইশতেহারের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১১ নভেম্বর, ২০০৮)

প্রত্যেক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলগুলো প্রথাগতভাবে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। নির্বাচন পরবর্তীকালে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো কী করবে তারই রূপরেখা হল নির্বাচনী ইশতেহার। ইশতেহারগুলোতে অনেক ভাল কথা থাকে, থাকে অনেক প্রতিশ্রুতি। নিঃসন্দেহে ভোটারদের একটি অংশ এ সকল প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রভাবিত হন। তাই নির্বাচনী ইশতেহার রাজনৈতিক দল আর ভোটারদের মাঝে একটি অলিখিত চুক্তি। তবুও ক্ষমতায় গিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী অঙ্গিকারগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে না। ফলে জনগণ হয় প্রতারিত।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করবে। নির্বাচনী ইশতেহারে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি তার একটি আংশিক ও প্রাথমিক ধারণা নিম্নে প্রদান করা হলো। এই প্রাথমিক ধারণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হল আগ্রহী নাগরিকদের মাঝে বিতর্কের সূচনা করা, যার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অগ্রাধিকার সম্পর্কে ঐকমত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে।

প্রথাগতভাবে নির্বাচনী ইশতেহারে দল ক্ষমতায় গেলে কী-করবে না-করবে তা লিপিবদ্ধ থাকে। আমরা মনে করি, আমাদের এ প্রথাগত ছকের বাইরে আসা জরুরি। নির্বাচনে পরাজিত হলে এবং ক্ষমতায় না গেলেও রাজনৈতিক দলগুলো কী করবে তা তাদের ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। বিরোধী দল বা জোটের অংশ হিসেবে তারা দায়িত্বশীল আচরণ করবে, নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেবে, রাজপথের পরিবর্তে জাতীয় সংসদকে সকল সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করবে, ছায়া মন্ত্রীসভা গঠন করবে, সর্বোপরি দেশকে সামনে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ক্ষমতাসীন সরকারকে সহায়তা করবে ইত্যাদি অঙ্গিকার সকল রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দল ক্ষমতার শুধুমাত্র ‘এ হার্ট বিট এওয়ে’ বা একটি হৃদস্পন্দন দূরে অবস্থান করে।

আমরা মনে করি যে, নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে টাইমফ্রেম বা সময়সীমা নির্ধারিত থাকা প্রয়োজন। যেমন, প্রথম ১০০ দিনে, প্রথম বছরে, দ্বিতীয় বছরে, তৃতীয় বছরে, চতুর্থ বছরে এবং শেষ বছরে কী করবে তার একটি মোটা দাগের কর্মপরিকল্পনা ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। আরো বাঞ্চনীয় ক্ষমতাসীন দলের/জোটের পক্ষ থেকে তাদের বাস্তবায়িত কর্মসূচির বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করা, যাতে ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত প্রতিশ্রুতিগুলো ফাঁকা বুলিতে পরিণত না হয়। নতুন সরকারের একটি অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে, বিশেষত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানো। এছাড়াও দেশের জন্য দলের একটি দীর্ঘমেয়াদি (যেমন, ২০২১ সালের জন্য) প্রত্যাশা বা ভিশন ইশতেহারে লিপিবদ্ধ থাকা আবশ্যক।

আমরা আরো মনে করি যে, নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের প্রথাগত পদ্ধতির পরিবর্তন আবশ্যক। নির্বাচনী ইশতেহার সাধারণত কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি লিখেন, অনেকসময় নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে, যা সংশ্লিষ্ট অনেকেই এমনকি পড়েও দেখেন না। ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় থাকাকালে এটি পর্যালোচনা করেন না। আমরা আশা করি যে, ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় সদস্যসহ সর্বস্তরের জনগণের সাথে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করবে এবং তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ভোটারদেরকে অবহিত করবে।

সরকার পরিচালনার মূলনীতি

‘‘প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।” (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ: ১১) একইসাথে জাতীয় জীবনের সকল স্তরে সমতা, ন্যায়পরায়ণতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সকলের জন্য সম-সুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান সরকার পরিচালনার মূলনীতি হওয়া প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সন্ত্রাস-দুর্নীতি-উগ্রবাদের মূলোৎপাটন, কার্যকর ও জবাদিহিমূলক প্রশাসন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

সরকার পরিচালনার মূলনীতির আরেকটি লক্ষ্য হওয়া উচিত আমাদের বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক প্রথার অবসান। বৃটিশরা বিতাড়িত হলেও এবং পাকিস্তানি প্রভুদের শাসনের ইতি ঘটলেও তাদের সৃষ্ট প্রভুত্বের কাঠামো এখনো আমাদের সমাজে বিরাজমান। বরং সামন্তবাদী কাঠামোর একটি নতুন সংস্করণ – পেট্রোন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক – এখন আমাদের ওপর জোরেসোরে জেঁকে বসেছে। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনগণকে সত্যিকারার্থে রাষ্ট্রক্ষমতার মালিকে পরিণত করে এ কাঠামোর অবসান ঘটানো আজ জরুরি। কারণ অনেকের ধারণা বিদ্যমান এ কাঠামো আমাদের সাধারণ জনগণকে ‘ভেড়ার পালে’ পরিণত করেছে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে ফেলেছে।

১. কার্যকর গণতন্ত্র

(ক) নির্বাচন পদ্ধতিকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস; দ্রুত নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি; প্রার্থী ও প্রার্থীদের ওপর নির্ভরশীলদের আয়-ব্যয়, সম্পদ, দায়-দেনা ও অপরাধী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভোটারদের পরিপূর্ণ তথ্যপ্রদান; সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ ও কালোটাকার মালিক, উড়ে এসে জুড়ে বসতে আগ্রহী ব্যবসায়ীসহ সদ্য অবসর গ্রহণকারী সামরিক ও বেসামরিক আমলা, নৈতিক স্খলন ও জনগণের সম্পদ অপচয়ের জন্য চিহ্নিত কর্মকর্তাদের নির্বাচনে প্রার্থীতা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলোর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন।

(খ) নির্বাচিত দলীয় সরকার যাতে ভবিষ্যতে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আরেক টার্মের পর বিলুপ্ত করার উদ্দেশ্যে ঐক্যমত্য সৃষ্টির জন্য সংসদ ও সংসদের বাইরে ফলপ্রসূভাবে আলোচনা অনুষ্ঠান।

(গ) নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা ও অধিক ক্ষমতা প্রদান, এর কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের বর্তমান প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখা এবং প্রধান বিরোধী দলসমূহের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে সৎ, যোগ্য ও দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের ভবিষ্যতে কমিশনে নিয়োগ প্রদান।

(ঘ) রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আর্থিক স্বচ্ছতা, মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় সংস্কার, দলের অঙ্গ সংগঠন বিশেষত ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠন বিলুপ্তির আইনি বিধান এবং রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের শর্তগুলোর কঠোরভাবে বাস্তবায়ন।

(ঙ) ভবিষ্যতে সহিংস রাজনীতির অবসান এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘুসহ সমাজের দুর্বল শ্রেণীদের ওপর নিপীড়ন রোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

(চ) সংসদ সদস্য ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত **'ইলেক্টরাল কলেজ'** গঠন করে যোগ্য ও সম্মানিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

(ছ) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার করার বিধান প্রবর্তন।

(জ) অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে সংবিধান মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন।

(ঝ) মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকর করার লক্ষ্যে আইনের যথাযথ সংশোধন, মানবাধিকার পরিপন্থি সকল কালো আইন বিলুপ্তিকরণ এবং বিচার বহির্ভূত সকল হত্যার অবসান।

(ঞ) বিরাজমান প্রধানমন্ত্রীকেন্দ্রিক শাসনের পরিবর্তে কার্যপ্রণালীবিধি পরিবর্তন করে সরকার পরিচালনায় মন্ত্রী পরিষদের সম্মিলিত দায়িত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

২. কার্যকর সংসদ

(ক) বিরোধীদল থেকে স্পীকার, অন্তত ডেপুটি স্পীকার মনোনয়ন ও দল থেকে স্পীকারের পদত্যাগ করার বিধান এবং জাতীয় সংসদকে সকল নীতি নির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণতকরণ।

(খ) 'চেকস এন্ড ব্যালেন্সেস' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদীয় কমিটিগুলো গঠন, বিরোধী দলের সদস্যদের সংসদীয় কমিটির প্রধান করার বিধান, স্বাধীনভাবে কাজ করার লক্ষ্যে কমিটিগুলোকে (কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের তলব করাসহ) অধিক ক্ষমতা প্রদান এবং কমিটির কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

(গ) সংসদ সদস্যদের সততা ও নৈতিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সংসদীয় এথিকস্ কমিটি' ও বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে 'নাগরিক ওয়াচ ডগ কমিটি' গঠন।

(ঘ) সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের আলোকে সংসদ সদস্যদের আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় নিবিষ্টকরণ।

(ঙ) সংসদ সদস্যদের এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের বাৎসরিক আয়-ব্যয়, সম্পদ, ঋণ কার্যক্রমের হিসাব ও আয়কর রিটার্ন প্রকাশ এবং নৈতিকতা ও সমতার বিবেচনার আলোকে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার পুনর্মূল্যায়ন।

(চ) সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির অবসান এবং সংসদ সদস্যদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধান বিরোধীদলসমূহের সাথে 'সিলেক্ট কমিটি'তে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন।

(ছ) সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন, যাতে একজন সদস্য তার সদস্য পদ তখনই হারাবেন যখন তার প্রদত্ত ভোটের কারণে সরকার পতনের আশংকা থাকে।

৩. কার্যকর প্রশাসন

(ক) ঔপনিবেশিক আমলের প্রভূত্বের কাঠামো দূরীকরণ এবং সৎ, দক্ষ, গণমুখি ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্যাডার সার্ভিসের পুনর্গঠন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের জনপ্রতিনিধিদের কাছে দায়বদ্ধকরণ এবং তাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্য যথাযথ বেতন-ভাতা নিশ্চিতকরণ।

(খ) প্রশাসনকে দলীয়করণের নীতির কার্যকরভাবে অবসান এবং মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে রিওয়ার্ড প্রদান এবং অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদানের রীতির অবসান।

(গ) গণমাধ্যমকে সরকারের 'চতুর্থ ব্রাঞ্চ' হিসেবে বিবেচনা করে এগুলোর স্বায়ত্বশাসন; স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আইনের যথাযথ ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন।

(ঘ) একজন সম্মানিত ও সাহসি ব্যক্তির অধীনে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে ন্যায়পাল নিয়োগ প্রদান।

৪. আইনের শাসন

(ক) বিচার বিভাগকে সত্যিকারার্থেই স্বাধীন ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, বিচারক নিয়োগ ও স্থায়ীকরণে স্বচ্ছ মানদণ্ড তৈরি করে তা বাস্তবায়ন এবং অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজ বিচারকদের অপসারণের লক্ষ্যে ন্যায়সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

(গ) বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ অতীতের সকল অমিমাংসিত বিচারিক কার্যক্রমগুলো সম্পন্নকরণ।

৫. বিকেন্দ্রিকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

(ক) সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের আলোকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলন করে এগুলোর ওপর 'স্থানীয় শাসনের' ভার প্রদান, কুদরত-ই-এলাহী পনির মামলার রায় বাস্তবায়নের এবং 'সাবসিডিয়ারিটি প্রিন্সিপলে'র আলোকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ। (**সাবসিডিয়ারিটি প্রিন্সিপল:** সকল

সমস্যা সর্বনিম্ন স্তরে সমাধানের প্রথম প্রচেষ্টা, যেগুলো এ স্তরে সমাধান সম্ভব নয়, সেগুলোই শুধু পরবর্তী ওপরের স্তরে সমাধানের প্রচেষ্টা; এর ফলে কেন্দ্রিয় সরকারের দায়-দায়িত্ব সীমিত হয়ে পড়বে।)

(খ) সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন সম্পন্নকরণ এবং স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

(গ) স্থানীয় সরকার কমিশনকে কার্যকরকরণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রাথমিকভাবে জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের ৪০ শতাংশ বরাদ্দ এবং পরবর্তীতে ক্রমাগতভাবে তা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ।

(ঘ) মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকে স্থানীয় উন্নয়ন কাজ থেকে বিরতকরণ।

৬. অর্থনীতি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ন্যায়পরায়ণতা

(ক) বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুশাসন এবং শহর-গ্রামের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণ ও সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন বাজেটের ৮০ শতাংশ যাতে সাধারণ জনগণের কল্যাণে ব্যয় হয় তা নিশ্চিতকরণ। দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে একটি নতুন সামাজিক চুক্তি প্রণয়ন।

(খ) শিল্পনীতি পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক, দক্ষতা ও মস্তিষ্কশক্তি-নির্ভর শিল্প কারখানা গড়ে তোলা; ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত, যথাযথ উৎসাহ কাঠামো তৈরি এবং ইপিজেডের পরিবর্তে 'ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিঙ্কেজ' সম্পন্ন শিল্প গড়ে তুলতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শিল্প এলাকা স্থাপন।

(গ) পোশাক শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও যথাযথ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, কারখানাসমূহে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মালিকদেরকে উৎসাহ প্রদান এবং ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ কারখানা গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'উৎসাহ কাঠামো' প্রণয়ন।

(ঘ) দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কর কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রমে সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠা নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ।

(ঙ) সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণখেলাপী এবং প্রয়োজনে ঋণ অনুমোদনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাগ্রহণ (যেমন, সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ) এবং ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ প্রদান।

(চ) তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে অগ্রাধিকার ও উৎসাহ প্রদান করে এটিকে একটি বিকাশমান শিল্প ও গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানী খাতে পরিণতকরণ।

(ছ) দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ, বেকারদের জন্য ব্যাপক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক উৎসাহ কাঠামো সৃষ্টিকরণ।

(জ) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে উন্নত বীজ, নতুন ধরনের ফসল উৎপাদন ও উন্নত প্রযুক্তি প্রবর্তনের লক্ষ্যে কৃষকদেরকে প্রশিক্ষিতকরণ ও উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজনে তাদেরকে সরাসরি ভর্তুকি দেয়ার বিধান। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করা জরুরি।

(ঝ) ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ, কৃষি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং সমাজে বৈষম্য দূরীকরণ ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঞ) তৃণমূলের জনগণকে স্থানীয় সংগঠন গড়ে তুলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণে প্রণোদিতকরণ এবং একটি 'রুরাল ব্যাংকিং' ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে ভর্তুকির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ঋণ, শস্য বীমা, জীবন বীমা, অক্ষমতা বীমা ইত্যাদির সুযোগ প্রদান।

(ট) ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যবহার করে গড়ে ওঠা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ব্যবসায়িক মালিকানা সঞ্চয়ীদেরকে প্রদান এবং 'মিউচুয়াল ফাণ্ড' গঠন করে দরিদ্র গোষ্ঠীর সম্পদের মালিকানা বৃদ্ধিকরণ।

(ঠ) বিদেশে কর্মরত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ (রেমিটেন্স) উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো (যেমন – সমবায় গঠন, মালিকানা ফাণ্ড, বণ্ড ফাণ্ড ইত্যাদি) সৃষ্টি এবং বিদেশে কর্মসংস্থানে আগ্রহীদের ভাষা ও প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

(ড) বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে দেশের জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এ সম্পর্কিত সকল চুক্তির বিধান প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঢ) হরতালের মতো ধ্বংসাত্মক ও মানবাধিকার লংঘনকারী কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রধান বিরোধী দলগুলোর সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে যথাযথ আইন প্রণয়ন।

৭. সন্ত্রাস ও দুর্নীতি

(ক) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ ও দলীয় প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে এগুলোর যথাযথ সংস্কার সাধন এবং পুলিশ বাহিনীকে 'পুলিশ সার্ভিসে' রূপান্তরিতকরণ।

(খ) সন্ত্রাসী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) অতীতের সকল সহিংস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও প্রয়োজনে পুনঃতদন্ত এবং সকল খুনী ও সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

(ঘ) দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা প্রশ্নাতীতভাবে নিশ্চিতকরণ; সৎ ও সাহসি ব্যক্তিদের ভবিষ্যতে কমিশনে নিয়োগ প্রদান করে দুর্নীতি বিরোধী চলমান অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত দেশে-বিদেশে গচ্ছিত সকল অর্থ সরকারি কোষাগারে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে কার্যকরকরণ। একইসাথে কমিশনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিতকরণ।

(ঙ) সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সততা ও জনস্বার্থ রক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সকল প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

(চ) সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ।

৮. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজিক সমস্যা ও জ্বালানী

(ক) সার্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন, গণমুখি এবং সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সমপর্যায়ে আনয়ন।

(খ) দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষকদের জাতীয় কোষাগার থেকে উপযুক্ত বেতন-ভাতা প্রদান, তাদের ওপর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সংসদ সদস্যদের খবরদারিত্বের অবসান এবং স্থানীয়ভাবে তাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ।

(গ) গ্রামীণ শিক্ষার মানোবনতির মাধ্যমে গ্রামে-গঞ্জে যে স্থায়ী 'নিম্নশ্রেণী'র সৃষ্টি হয়েছে তা অবসানের লক্ষ্যে শিক্ষা এবং শিক্ষকদের মানোন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান।

(ঘ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লেজুড়বৃত্তির রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে সেশনজটের ও শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণের অবসান এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানকে সত্যিকারার্থে বিদ্যা ও মুক্ত চিন্তা চর্চার বিদ্যাপীঠে পরিণতকরণ। দলের অঙ্গ সংগঠন বিলুপ্তির আইনি বিধান কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন।

(ঙ) স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠাকরণ। কমবিত্তের জনগণের জন্য সুলভে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ।

(চ) সামাজিক সমস্যা (যেমন – জন্মনিয়ন্ত্রণ, মাদকাসক্তি, ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাসন, পারিবারিক নির্যাতন ইত্যাদি) দূরীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি সংগঠনসমূহের মাধ্যমে জনগণকে জাগিয়ে তুলে ও সংগঠিত করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ছ) আর্সেনিকমুক্ত ও নিরাপদ পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে 'সারফেস ওয়াটার' ব্যবহারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) জ্বালানী খাতে সকল দুর্নীতি ও অনিয়মের মূল উৎপাটন করে জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিকল্প জ্বালানীর (যেমন, সৌর বিদ্যুৎ) উৎস সৃষ্টির জন্য কার্যকরভাবে উৎসাহ প্রদান।

৯. নারী ও বঞ্চিতদের অধিকার

(ক) নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দশম জাতীয় সংসদে ৩৩ শতাংশ, একাদশ সংসদে ৪০ শতাংশ এবং দ্বাদশ সংসদে (অর্থাৎ সম্ভবত ২০২২ সালে) ৫০ শতাংশ নারী সদস্য যেন সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

(খ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যতে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ৪০ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ।

(গ) নারী নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, নারী ও কন্যাশিশুদের অপুষ্টি এবং তাদের প্রতি বঞ্চনার কার্যকরভাবে অবসানের লক্ষ্যে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও সামাজিক আন্দোলনের সূচনাকরণ।

(ঙ) প্রতিবন্ধীদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং তাদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

(চ) আধিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধান স্বীকৃত অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাদের সকল ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ।

১০. প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ; নদী, ভূমি ইত্যাদি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(খ) বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে উপকূলীয় এলাকা, বিশেষত দেশের দক্ষিণাঞ্চল তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

(গ) প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে সম্পাদিত সকল চুক্তি প্রকাশ এবং প্রয়োজনে নতুন করে দর কষাকষির মাধ্যমে পুর্নচুক্তিকরণ।

(ঘ) সামুদ্রিক বন্দর, মিষ্টি পানি, কয়লা ও গ্যাস সম্পদ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ও যথাযথ ব্যবহারের জন্য পদক্ষেপ এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিদেশী কারিগরি সহায়তা গ্রহণ।

এটি একটি নির্বাচনী ইশতেহার সংক্রান্ত খসড়া ধারণাপত্র। এর মূল উদ্দেশ্য জনগণের মাঝে আলাপ-আলোচনার সূচনা এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রভাবিত করা। এটি নিতান্তই খসড়া বলে 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে আমরা সকলের পরামর্শ ও মতামত কামনা করছি, একইসাথে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ সম্পর্কে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সোচ্চার হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।